পশ্চিমবঙ্গ সরকার — V

বিদ্যালয় কম্পিউটার শিক্ষা



ACES Infotech Pvt. Ltd.

29 | Gift

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা	**২-৯**
★ কম্পিউটার তৈরীর ইতিহাস	৩
★ অ্যাবাকাস, নেপিয়ারের বোন, ডিফারেন্সিয়াল ইঞ্জিন, অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন	৩,৪
★ বিট-বাইট	৪
★ কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ	৫
★ ডিজিটাল কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ	৬
★ অনুশীলনী	৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : সামগ্রিক কম্পিউটার ব্যবস্থা	**১০-১৬**
★ কীবোর্ড, মাউস	১১
★ মনিটর	১২
★ প্রিণ্টার, স্পিকার, মোডেম, হার্ডডিস্ক	১৩
★ সিডিরম ড্রাইভ ও সিডি রম	১৫
★ অনুশীলনী	১৬
তৃতীয় অধ্যায় : কম্পিউটারের সংগঠন ও সফটওয়্যার	**১৭-২৫**
★ কম্পিউটারের সংগঠন	১৮
★ মেমরী	২০
★ সফটওয়্যার ও অপারেটিং সিস্টেম	২০
★ কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করার পদ্ধতি	২১
★ অনুশীলনী	২৫
চতুর্থ অধ্যায় : সফটওয়্যার সর্ম্পকে ধারণা	**২৬-৪২**
★ লিনাক্স	২৭
★ জিম্প	২৮
★ পেইন্ট	৩৪
★ জি-এডিট	৩৭
★ ক্যালকুলেটর	৩৯
★ অনুশীলনী	৪২

প্রথম অধ্যায়

কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে

- কম্পিউটার তৈরীর ইতিহাস
- কম্পিউটারের ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতি
- প্রাথমিক পর্যায়ের গণকযন্ত্র -
  অ্যাবাকাস, নেপিয়ারের বোন, ডিফারেন্সিয়াল ইঞ্জিন, অ্যানালিটিকাল ইঞ্জিন, পাঞ্চ কার্ড সিস্টেম
- বিট-বাইট
- কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ
  অ্যানালগ, ডিজিটাল ও হাইব্রিড
- ডিজিটাল কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ
  সুপার কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার , পার্সোনাল কম্পিউটার
- কম্পিউটারের পরিচিতি ও চিত্র

কম্পিউটার তৈরীর ইতিহাস ঃ

কম্পিউটার যন্ত্রটির উৎপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ইতিহাস জানা যায় নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে গণনা করার প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকটা অজ্ঞাতসারেই কম্পিউটার তৈরীর গোড়াপত্তন হয়েছিল। কালের বির্বতনের সাথে মানুষের চিন্তাচেতনার বিকাশ এবং বহিঃপ্রকাশ হয়েছে অসংখ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে।

অ্যাবাকাসঃ

অ্যাবাকাস হল একধরণের গণনা করার যন্ত্র। চীনদেশে প্রথম ইহা তৈরী ও ব্যবহার করা হয়েছিলো। একটি কাঠের ফ্রেমের ভিতরে লম্বালম্বি দড়ি বেঁধে তাতে বিভিন্ন রঙের বল গেঁথে তৈরী করা হতো এই যন্ত্র। এর মাধ্যমে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা যেত।

নেপিয়ারের বোন বা স্লাইড রুলঃ

অ্যাবাকাস এর পরে যে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়েছিলো তার নাম নেপিয়ারের বোন। জন নেপিয়ার হিসাব নিকাশের জন্য হাতির দাঁতের ছোট ছোট অংশ দিয়ে একটি যন্ত্র তৈরী করলেন, যার সাহায্যে সহজে গুণ করা যেত। ইহাতে এগারোটি দণ্ড ছিল। যেহেতু ইহাতে হাড় বা অস্থি ছিলো তাই ইহাকে নেপিয়ারের বোন বলা হয়।

ডিফারেন্সিয়াল ইঞ্জিনঃ

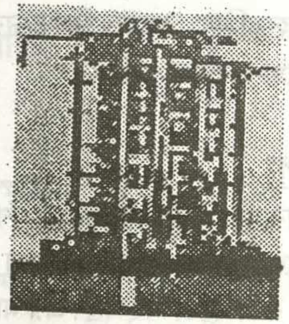
চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়। 1812 সালে তিনি ডিফারেন্সিয়াল ইঞ্জিন নামে এক যন্ত্রের নক্সা তৈরী করেন, এটি দিয়ে ছোটো খাটো যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সব করা যেত। এই যন্ত্রটি লিভার, গিয়ার, হাতল ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। তিনিই প্রথম কিভাবে যন্ত্রে মেমরী বা স্মৃতি ব্যবহার করা যায় তার পরিকল্পনা করেন।



চিত্র- চার্লস ব্যাবেজ

অ্যানালাইটিকাল ইঞ্জিনঃ

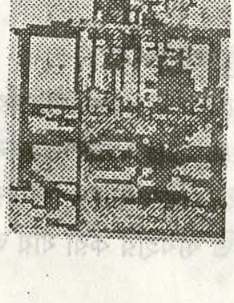
চার্লস ব্যাবেজ পরে যে যন্ত্রটি তৈরী করার পরিকল্পনা করেন তার নাম অ্যানালাইটিকাল ইঞ্জিন। ইহাতে আধুনিক কমপিউটারের স্মৃতি ভাণ্ডার বা মেমরীর মতন একহাজার রাশি জমা রাখার চিন্তা করেছিলেন। ইঞ্জিনটির অপর অংশে এক মিনিটে 50 টি অংক সংখ্যার 50 টি যোগ বা বিয়োগ অথবা দুটি 50 টি অংক সংখ্যার গুণ এক মিনিটে করার ব্যবস্থা করেছিলেন।



চিত্র- অ্যানালাইটিকাল ইঞ্জিন

পাঞ্চকার্ডঃ

1890 সালে হার্মান হলরিথের তৈরী যন্ত্র আমেরিকার জনসংখ্যা গণনার কাজে ব্যবহার করা হয়। তিনি একধরণের কার্ড নিয়ে তার বিভিন্ন স্থানে ছিদ্রের সাহায্যে বিভিন্ন সংখ্যা বোঝাবার ব্যবস্থা করেন। এই সছিদ্র কার্ডগুলিকে বলা হয় পাঞ্চকার্ড।



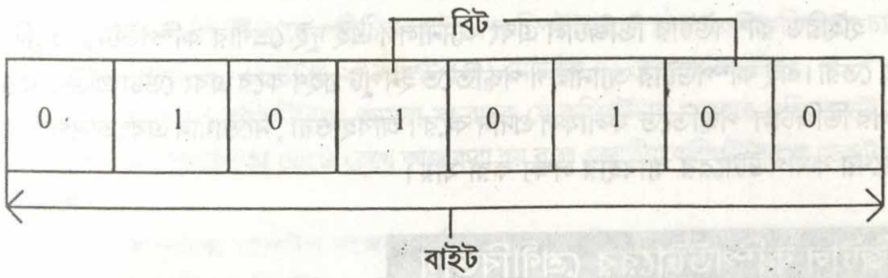
চিত্র- পাঞ্চকার্ড

বিট বাইট

কম্পিউটারের সব সংখ্যাই 0 অথবা 1। যেহেতু মানুষের পাঠযোগ্য ভাষা কম্পিউটার বুঝতে পারে না, তাই কম্পিউটারের বোধযোগ্য করার জন্য কম্পিউটারকে প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশই 0 বা 1 এর মাধ্যমে দেওয়া হয় অথবা আমাদের দেওয়া নির্দেশকে কম্পিউটারই তার নিজের বোধযোগ্য 0 বা 1 বা উভয়ের বিভিন্ন সমন্বয়ে রূপান্তরিত করে নেয়। কারণ

কম্পিউটার সব কাজই বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশের সাহায্যে করে। এই বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশগুলির প্রতিটি কেবলমাত্র দুটি অবস্থানকে বোঝে। এই দুটি অবস্থান হলো, অন এবং অফ। কম্পিউটারের কাছে অন মানে 1 (ওয়ান) বা এক এবং অফ মানে 0 (জিরো) বা শূণ্য। কম্পিউটারের ভাষায় একেই (0 এবং 1) বিট (Bit) বলা হয়। কম্পিউটার সমস্ত নির্দেশ, সমস্ত সংখ্যা এবং অক্ষরকেই এই 0 এবং 1 দ্বারা গ্রহণ করে থাকে। পাশাপাশি আটটি বিট-এর সমন্বয়কে বাইট (Byte) বলা হয়।

কম্পিউটারে প্রত্যেকটি অক্ষরের (Character) প্রতিনিধিস্বরূপ এক একটি বাইট থাকে। এছাড়া প্রত্যেকটি চিহ্ন যেমন + (প্লাস) বা - (মাইনাস) বা * (তারা) ইত্যাদি চিহ্নের জন্য নির্দিষ্ট কোড থাকে এক বাইটের।



কম্পিউটারের শ্রেণী বিভাগ

কম্পিউটারের গঠন, আকার ও দক্ষতা ভেদে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। সাধারণতঃ কাজের ধরণ ও প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে কম্পিউটারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - ১) অ্যানালগ, ২) ডিজিটাল এবং ৩) হাইব্রিড।

১) অ্যানালগ কম্পিউটারঃ

এই কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্য, পর্যায়ক্রমিকভাবে ওঠানামার পরিমাণ নেওয়া। অ্যানালগ কম্পিউটার কাজ করে কোন ভৌত রাশিকে মেপে, যে সমস্ত জিনিসের মাপ একটানা বাড়ে বা কমে। যেমন- উষ্ণতা, আয়তন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। তাপ, চাপ, তরল পদার্থের প্রবাহ ইত্যাদি পরিবর্তনশীল তথ্যের জন্য যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গর সৃষ্টি হয়, অ্যানালগ কম্পিউটার তা

ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করে। এই জন্য কারখানা, ল্যাবরেটরীর নানা পরীক্ষায় মাপজোক, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার হিসাব নিকাশের কাজে ব্যবহার করা হয়। 'অ্যানালজী' শব্দটি থেকে অ্যানালগ কথাটি এসেছে।

২) ডিজিটাল কম্পিউটারঃ

'ডিজিট' শব্দটি থেকে ডিজিটাল শব্দের উৎপত্তি। প্রচলিত অর্থে কম্পিউটার বলতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে বোঝানো হয়ে থাকে। ইহাতে বর্ণ, সংখ্যা, সংকেত ইত্যাদি ইনপুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূলত গাণিতিক নীতির ভিত্তিতে কাজ করে এবং সূক্ষ ও নির্ভুল ফলাফল প্রদান করে। এই ধরণের কম্পিউটারগুলি শূন্য (0) এবং এক (1) দ্বারা সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে।

৩) হাইব্রিড কম্পিউটারঃ

হাইব্রিড কম্পিউটার ডিজিটাল এবং অ্যানালগ এই দুই শ্রেণীর কম্পিউটার প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরী। এই কম্পিউটার অ্যানালগ পদ্ধতিতে ইনপুট গ্রহণ করে এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করার পর ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল প্রদান করে। আবহাওয়া , নভোযান এবং হাসপাতালে এই ধরণের কমপিউটারের ব্যাবহার লক্ষ্য করা যায়।

ডিজিটাল কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ

আকার, আকৃতি, আয়তন ও কার্যকারীতা ভেদে ডিজিটাল কম্পিউটারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১)সুপার কম্পিউটারঃ

এই শ্রেণীর কম্পিউটারগুলোর

-তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষমতা বেশী।

- কার্যসম্পাদন বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত করতে পারে।

- আকারে বড় হয়।

- এর গতি প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে এক বিলিয়ন ক্যারেক্টার।

ব্যবহার ঃ সূক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জঙ্গি বিমান, মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণঃ C-RAY-1, CYBER-205 ইত্যাদি।

২) মিনি কম্পিউটারঃ

এই শ্রেণীর কম্পিউটারগুলোতে

-পাঁচ থেকে শুরু করে একশোর বেশী টার্মিনাল জুড়ে দেওয়া যায়। প্রত্যেক টার্মিনালে মনিটর, কিবোর্ড ইত্যাদি থাকে।

-যতগুলো টার্মিনাল থাকবে ততগুলো ব্যবহারকারী একসাথে কাজ করতে পারবে।

-মাইক্রোকম্পিউটারের তুলনায় ইহাদের দাম, মেমরী সাইজ, সি পি ইউ এর গতি সবই বেশী।

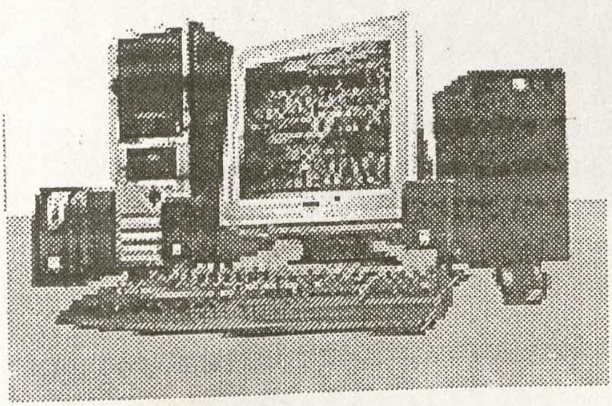
ব্যবহার- বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ইহা ব্যবহার করা হয়।

৩) পি সিঃ

মাইক্রোকম্পিউটার মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরী। এই শ্রেণীর কম্পিউটারগুলো পার্সোনাল কম্পিউটার বা পি সি নামে পরিচিত। মাইক্রোকম্পিউটারকে গঠন ও আকৃতিভেদে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১) ডেস্কটপ ২) ল্যাপটপ ৩) নোটবুক ৪) হোম কম্পিউটার

ডেস্কটপ কম্পিউটারঃ আমরা সচরাচর যে কম্পিউটার ব্যবহার করি তাহাই হল ডেস্কটপ কম্পিউটার। সাধারণতঃ ডেস্কে রেখে কাজ করা হয় বলে এজাতীয় কম্পিউটারকে ডেস্কটপ কম্পিউটার বলে।

ল্যাপটপঃ ল্যাপটপ শব্দের অর্থ হল কোলের উপর। সাধারণত যাত্রাপথে কোলের উপর রেখে এই জাতীয় কম্পিউটারে কাজ করা যায় বলে বিজ্ঞানীরা এই ধরণের কম্পিউটারের নাম রেখেছেন ল্যাপটপ।



চিত্র - ডেস্কটপ কম্পিউটার

কম্পিউটার কি ?

কম্পিউটার হল এমন একটি যন্ত্র যার নিজের কোন বুদ্ধি বিবেচনা নেই। মানুষ কম্পিউটারকে দিয়ে যেভাবে কাজ করায় কেবলমাত্র সেভাবে কাজ করে। Computer একটি ইংরাজী শব্দ। ইহা Computare শব্দ থেকে এসেছে। বাংলায় Computer শব্দের অর্থ হল গণনা করা বা নির্ণয় করা। কম্পিউটার গণনা করতে পারে বা নির্ণয় করতে পারে।

সহজভাবে বলা যায় যে, কম্পিউটার হল একটি ইলেকট্রিক যন্ত্র যা তথ্যের উপর কাজ করে যুক্তি সংগত ভাবে এবং অতি দ্রুত সঠিকভাবে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারে ও উহার ফলাফল প্রদান করতে পারে।

কম্পিউটার আমাদের দেওয়া নির্দেশ জমা করে রেখে দিতে পারে যা পরবর্তী সময়ে বারবার ব্যবহার করা যায়।

অনুশীলনী

১) কম্পিউটারের জনক কাকে বলা হয়? তিনি প্রথম যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন তার নাম কি?

২) বিট ও বাইট বলতে কি বোঝ?

৩) কাজের ধরণ ও প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে কম্পিউটারকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেকটি ভাগের বর্ণনা দাও।

৪) ডিজিটাল কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ কর।

৫) ল্যাপটপ কম্পিউটারের বর্ণনা দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামগ্রিক কম্পিউটার ব্যবস্থা

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে

- কীবোর্ড
- মাউস
- মনিটর
- প্রিন্টার
- স্পিকার
- মোডেম
- হার্ডডিস্ক
- ফ্লপিডিস্ক
- সি ডি ড্রাইভ ও সি ডি রম

হার্ডওয়্যার পরিচিতি

হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো। অর্থাৎ যে সকল জিনিস ধরা ছোঁয়া যায় এবং যার সমন্বয়ে কম্পিউটারের শারীরিক কাঠামো গঠিত হয় তাহাই হল হার্ডওয়্যার।

ইহাকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়

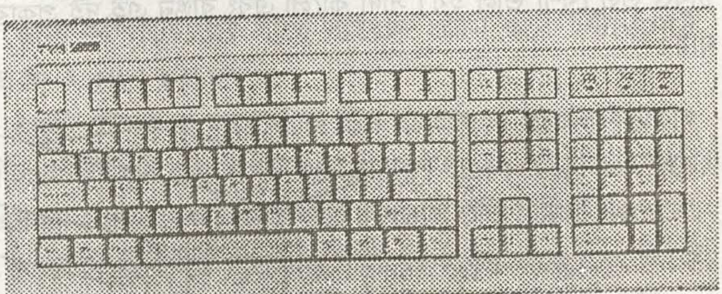
১)ইনপুট ডিভাইস

২)আউটপুট ডিভাইস

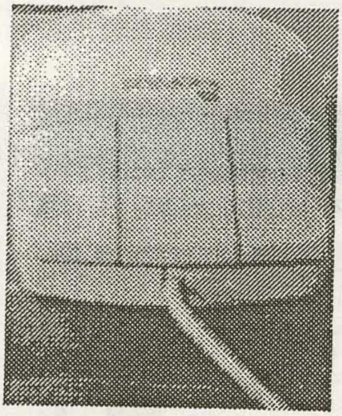
৩)সি পি ইউ

কী বোর্ড ঃ ইহা একটি ইনপুট ডিভাইস, যাহার সাহায্যে কম্পিউটারে সরাসরি তথ্য ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। ইহাতে টাইপরাইটারের মতন অনেকগুলি বাটন থাকে। এগুলির ওপরে সাধারণত ইংরাজী বর্ণমালা, সংখ্যা এবং চিহ্ন বা সংকেত মুদ্রিত থাকে। একটি তারের সাহায্যে ইহা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। কীবোর্ডে এণ্টার লেখা একটি বাটন থাকে। প্রয়োজনীয় নির্দেশটি কীবোর্ডের মাধ্যমে টাইপ করে ঐ বাটনটি টিপলেই তা পালন করতে শুরু করে কম্পিউটার ।এটির ব্যবহারিক ব্যয় কম। সাধারণত একটি কীবোর্ডে 84 টি, 101 টি বা 102 টি কী (Key) থাকে। তবে আজকাল আরও কী যুক্ত নানা ধরণের কী-বোর্ড বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

ছবি ঃ কি বোর্ড



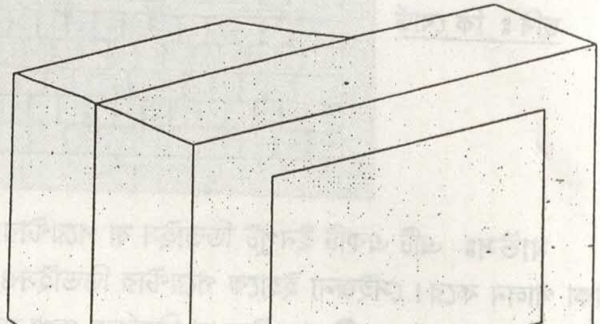
মাউসঃ এটি একটি ইনপুট ডিভাইস যা পয়েণ্টার বা কোন কিছুকে চিহ্নিত করার ভূমিকা পালন করে। সেইজন্য ইহাকে পয়েণ্টার ডিভাইসও বলা হয়। কম্পিউটারের পর্দায় তীর চিহ্নের চেহারার একটি পয়েণ্টার বা নির্দেশক দেখা যায়, যাকে মাউস পয়েণ্টার বলে। সাধারণতঃ কম্পিউটারের পাশে একটি প্যাডের উপরে মাউসটি রাখা থাকে। এই প্যাডটিকে মাউস প্যাড বলে।



ছবিঃ মাউস

মাউসে কমপক্ষে দুটি বাটন থাকে। কোন বাটনকে চাপ দেওয়াকে ক্লিক করা বলে। মেকানিজম এর উপরে ভিত্তি করে মাউসকে দুইভাগে ভাগ করা যায়-
১)মেকানিক্যাল মাউস ২) অপটিক্যাল মাউস।

মনিটরঃ কম্পিউটারের টেলিভিশনের মতন অংশটির নাম মনিটর। মনিটরের পুরো নাম হলো (ভি ডি ইউ) বা ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট। মনিটরে ছবি বা প্রদর্শিত তথ্যাবলী প্রধানতঃ অনেকগুলি বিন্দুর সমষ্টি। এই বিন্দুগুলিকে পিক্সেল বলে। পিক্সেল এর পরিমাণ যত বেশী হয়, ছবিও তত বেশী ভাল হয়। সাদা কালো এবং রঙিন এই দুই প্রকার মনিটর প্রধানত পাওয়া যায়।

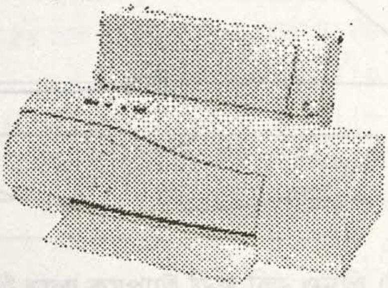


ছবিঃ মনিটর

প্রিণ্টারঃ ব্যবহারকারী যখন কম্পিউটার থেকে কোনও তথ্য কাগজে মুদ্রিত অবস্থায় পেতে চান, তখন যে আউটপুট ডিভাইসটি ব্যবহার করতে হবে, সেটির নাম প্রিণ্টার। প্রিণ্টার নানা প্রকারের হতে পারে। যে প্রিণ্টার একটি পুরো অক্ষরই একেবারে মুদ্রিত করতে পারে তাকে বলে ক্যারেকটার প্রিণ্টার। যে প্রিণ্টার একটি পুরো লাইন একেবারে মুদ্রিত করতে পারে তাকে বলে লাইন প্রিণ্টার।

যে প্রিণ্টার একটি পুরো পাতা একেবারে মুদ্রিত কর্‌তে পারে তাকে বলে পেজ প্রিণ্টার।

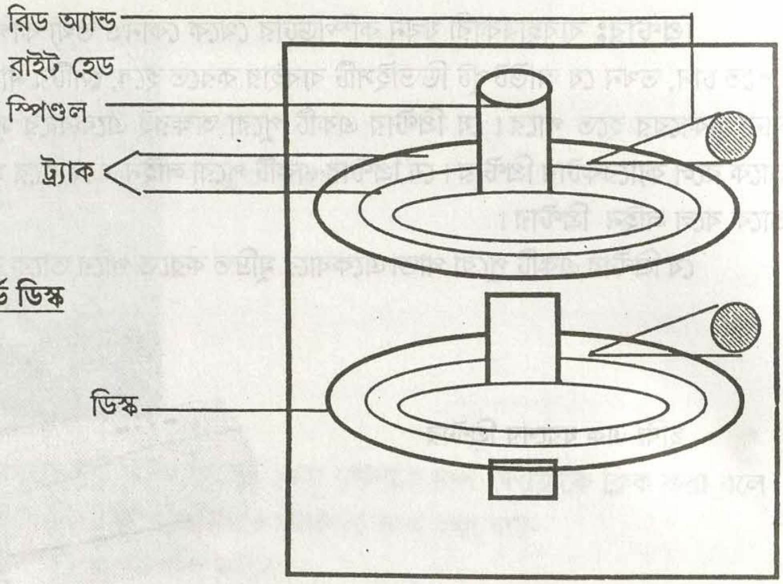
ছবিঃ এক ধরণের প্রিণ্টার



স্পিকারঃ কম্পিউটারের সাথে আউটপুট ইউনিট হিসাবে স্পিকার ব্যবহার করা হয়। ইণ্টারনাল বা এক্সটারনাল স্পিকারের মাধ্যমে অডিও শব্দ শোনা যায়। ইহা ব্যবহার করে কম্পিউটার থেকে গান বা মিউজিক শোনা যায়।

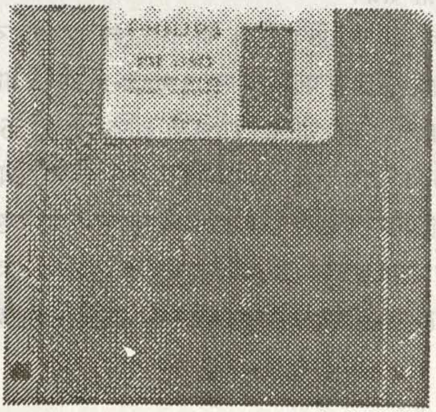
মোডেমঃ 'মডিউলেটর/ডিমডিউলেটর' শব্দ দুটি থেকে মোডেম শব্দটির উৎপত্তি। ইহাকে টেলিফোন লাইন এবং কম্পিউটারের সাথে সংযোগ প্রদান করে ইণ্টারনেটে কম্পিউটারের তথ্যাবলী প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

হার্ড ডিস্কঃ এটি একটি চৌম্বক বা ম্যাগনেটিক ডিস্ক যা আসলে পাতলা বৃত্তাকার ধাতু নির্মিত একটি প্লেট। এই প্লেটটির দুদিকেই চৌম্বক বস্তুর আবরণ থাকে। প্লেটটি ধাতু দিয়ে তৈরী। একটি ডিস্কপ্যাকে এরকম বেশ কয়েকটি ডিস্ক থাকে। যেগুলি প্রতি মিনিটে 5400 বা তার বেশী বাক চক্রাকারে ঘোরে। প্রতি ডিস্কে বেশ কিছু সমকেন্দ্রিক বৃত্ত থাকে, যেগুলিকে চোখে দেখা যায় না,এদের ট্রাক বলে। ডিস্কপ্যাকের সবগুলি তলের একই ব্যাসার্ধযুক্ত বৃত্তগুলিকে বলা হয় সিলিণ্ডার বা চোঙ। এই হার্ডডিস্কের মধ্যে ধাতুর প্লেটগুলির খুব কাছে এক একটি রিড অ্যাণ্ড রাইট হেড থাকে, যা রেকর্ডিং সাবস্টেসের চৌম্বক ধর্মের তারতম্য থেকে তথ্য অনুধাবন এবং সংরক্ষণ করতে পারে।



ছবি : হার্ড ডিস্ক

ফ্লপি ডিস্কঃ নমনীয় প্লাস্টিক জাতীয় বস্তু বা ফেক্সিবেল প্লাস্টিক মেটেরিয়াল দিয়ে ফ্লপি ডিস্ক তৈরী হয়। সেই কারণেই এর নাম ফ্লপি ডিস্ক। এই ডিস্কে পাতলা গোলাকৃতি প্লাস্টিকের উভয়দিকে চৌম্বক পদার্থের আবরণ থাকে, যাতে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এই আবরণের উপরে অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য আকৃতির চৌম্বক গুঁড়ো হিসাবে তথ্য সন্নিবিষ্ট হয় রেকর্ডিং এর মাধ্যমে। ডিস্কটি একটি চারকোণা বাক্সের মধ্যে থাকে। ইহা বিভিন্ন মাপের বা ব্যাসের হতে পারে। যেমন 8 ইঞ্চি, 5.25 ইঞ্চি, 3.5 ইঞ্চি।



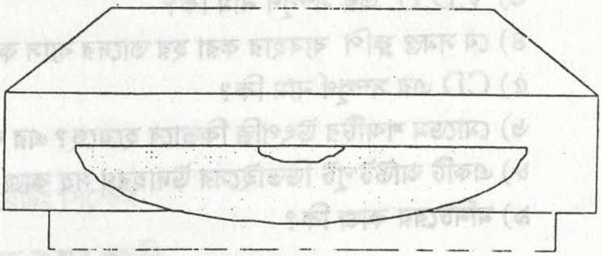


ছবিঃ ফ্লপি ডিস্ক বাইরে থেকে যেমন দেখি ছবি ঃ ফ্লপি ডিস্কের ভিতরে থাকে নমনীয় ডিস্ক

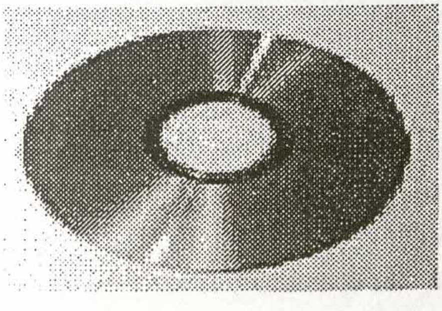
সিডিরম ড্রাইভঃ যে যন্ত্রের সাহায্যে সিডি রমে সংরক্ষিত তথ্য পাওয়া যায় বা চালানো যায় তাকে সিডিরম ড্রাইভ বলে।

ইহাতে তথ্য পড়ার জন্য ড্রাইভটি লেজার বীম ব্যবহার করে। লেজার বীম পিট এবং ল্যাণ্ডে পড়লে বাইনারী ডিজিট 0 এবং 1 প্রাপ্তির খবর পাঠায়। লেজার বীমের সাহায্যে সি ডি তে ছিদ্র করে তথ্য সংরক্ষিত হয়। ইহা দুই প্রকার - ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল। একটি সাধারণ সিডিরম ড্রাইভের ডেটাপরিবহণ ক্ষমতা হল প্রতি সেকেণ্ডে 150 কিলোবাইট।

ছবি ঃ কমপ্যাক্ট ড্রাইভ



সি ডি রমঃ সি ডি রম এর পুরো কথাটি হলো কমপ্যাক্ট ডিস্ক রিড ওনলি মেমরী। এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি। সি ডি তে তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য লেজার বীম ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ভাবে বলা হয় ইহাতে তথ্য একশত বছর অক্ষুণ্ণ থাকে। সাধারণত সি ডি রমের ধারণ ক্ষমতা 650 মেগাবাইট। এতে তথ্য রেকর্ড করার জন্য খুব শক্তিশালী লেজার ব্যবহার করে খুব সূক্ষ ছিদ্র করা হয়, একে কারিগরী ভাষায় বলা হয় পিট এবং দুটি পিটের মধ্যবর্ত্তী মধ্যবর্ত্তী স্থানকে বলা হয় ল্যাণ্ড। পিট এবং ল্যাণ্ড বাইনারী সংখ্যা 0 এবং 1 দিয়ে প্রকাশ করা হয়।



ছবি ঃ কমপ্যাক্ট ডিস্ক

অনুশীলনী

১) ইনপুট ডিভাইস কাকে বলে?
২) দুটি ইনপুট ডিভাইসের উদাহরণ দাও ও তাদের কাজ বল?
৩) V.D.U. এর সম্পূর্ণ নাম কি?
৪) যে সমস্ত ফ্লপি ব্যবহার করা হয় তাদের ব্যাস কত?
৫) CD এর সম্পূর্ণ নাম কি?
৬) মোডেম শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? এর কাজ কি?
৮) একটি আউটপুট ডিভাইসের উদাহরণ সহ কাজ বল?
৯) মনিটরের কাজ কি?

তৃতীয় অধ্যায়

কম্পিউটারের সংগঠন ও সফটওয়্যার

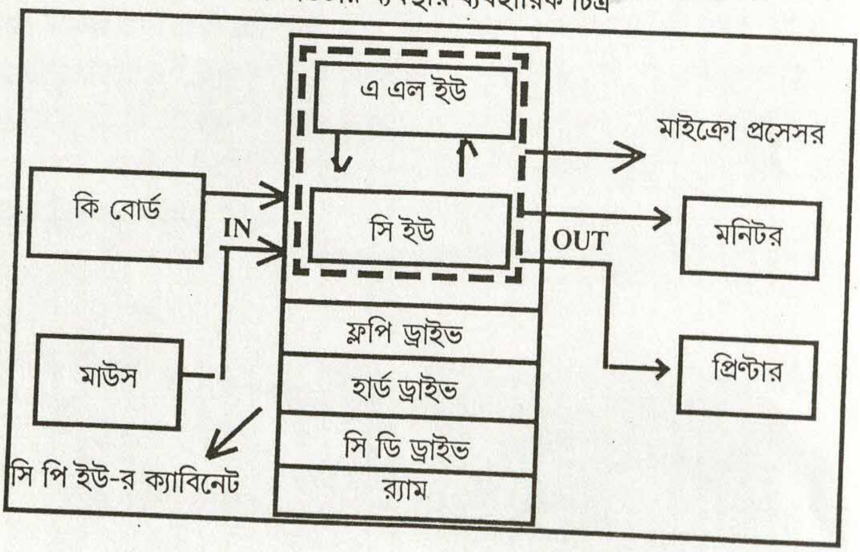
এই অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে

- সি পি ইউ
- মেমরী বা স্মৃতি
- সফটওয়্যার ও অপারেটিং সিস্টেম
- কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করার পদ্ধতি

মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই অ্যাবাকাস বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে আজ আমাদের অতি চেনা 'পার্সোনাল কম্পিউটারে' পরিণত হয়েছে। ইহা মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত। এই তিনটি অংশ হল ঃ ১) ইনপুট ২) প্রসেসিং (সি পি ইউ) এবং ৩) আউটপুট।

ইনপুট ডিভাইস এর মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারকে কাজ করবার নির্দেশ দিই। সেই নির্দেশ আসে সি পি ইউ- এর অভ্যন্তরস্থ কন্ট্রোল ইউনিটে । এই অংশের সাথে যুক্ত থাকে এরিথমেটিক লজিক ইউনিট (ALU) এবং বিভিন্ন প্রকার মেমরী বা স্মৃতি ব্যবস্থা। আউটপুট ইউনিট সরাসরি কন্ট্রোল ইউনিটের সাথে যুক্ত থাকে। ALU -তে গাণিতিক প্রসেসিং এর কাজ হয় এবং আমাদের প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে সেই প্রাপ্ত ফলাফল মেমরীতে সংরক্ষিত হয় এবং আমাদের প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে সেই প্রাপ্ত ফলাফল মেমরীতে সংরক্ষিত হয় বা আউটপুট ডিভাইস এর মাধ্যেমে বার হয়ে আসে।

কম্পিউটার ব্যবস্থার ব্যবহারিক চিত্র



সি পি ইউঃ কম্পিউটার ব্যবস্থার মস্তিস্ক বলা হয় সি পি ইউ কে, ইহাই মূল কম্পিউটার। ইহার প্রধান অংশগুলি হল কন্ট্রোল ইউনিট এবং এরিথমেটিক অ্যাণ্ড লজিক ইউনিট। সি পি ইউ ছাড়াও কম্পিউটারের আরও বিভিন্ন অংশ একটি বিশেষভাবে প্রস্তুত বাক্সের মধ্যে রাখা থাকে।

এই বাক্সটিকে বলা হয় ক্যাবিনেট। সি পি ইউ কম্পিউটারের যাবতীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কম্পিউটারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এর সাহায্যে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। কমপিউটার সার্কিটের মাইক্রোপ্রসেসরই হল আসল সি পি ইউ।



চিত্র : যন্ত্রাংশ সমেত সি পি ইউ-র ক্যাবিনেট

এ এল ইউ- এরিথমেটিক অ্যাণ্ড লজিক ইউনিটকে সংক্ষেপে ALU বলা হয়। এ অংশটি গঠনের প্রধান হাতিয়ার হলো রেজিস্টার, যা তথ্য পরিবহনের কাজ করে থাকে। এই অংশটি ডেটা বা তথ্যের উপর যাবতীয় গণনার কাজ যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি সম্পাদন করে এবং পাশাপাশি যুক্তি সম্পর্কিত যেমন 'না' এবং 'হ্যাঁ' কাজগুলোও করে থাকে।

কন্ট্রোল ইউনিট- ইহাকে বলা হয় কম্পিউটারের প্রাণ। মেমরীতে কখন তথ্যের প্রায়োজন হবে, ক্যাশ মেমরী থেকে তথ্য মেমরীতে নিতে হবে কিনা নিয়ন্ত্রণ অংশ বা কন্ট্রোল ইউনিট ঠিক করে। মেমরী ইনপুট গ্রহণ করার কাজ আর প্রক্রিয়াকরণের পর তথ্য আউটপুটের মাধ্যমে বের করে দেবার কাজও ইহা করে থাকে।

মেমরী বা স্মৃতি

আমরা যেমন কোন বিষয় মনে রাখতে পারি, কম্পিউটারেরও তেমনি কোন কিছু মনে রাখার ক্ষমতা আছে। কম্পিউটার যেখানে তথ্যাবলী জমা করে রাখে তাকেই মেমরী বা স্মৃতি বলে। ইহার সাথে কম্পিউটারের অন্যান্য অংশের সরাসরি সংযোগ থাকে। যে কোন তথ্য দিয়ে কম্পিউটারে কাজ করতে হলে, প্রথমে তা মেমরীতে জমা রাখতে হয়। মেমরীর একক হল বিট।

মেমরীকে সাধারণভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

১) প্রাথমিক বা প্রাইমারী মেমরী।

২) ঐচ্ছিক বা সেকেণ্ডারী মেমরী।

প্রাইমারী মেমরীর মধ্যে আছে র‍্যাম (RAM) এবং রম (ROM। আর স্টোরেজ ডিভাইসগুলি হল সেকেণ্ডারী মেমরী। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেমরীকে আরো দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ- ১) অস্থায়ী বা র‍্যাম (RAM) ২) স্থায়ী বা রম (ROM)।

কম্পিউটার বন্ধ করার সাথে সাথে মেমরী থেকে সংরক্ষিত তথ্যগুলি মুছে যায়।

ইনপুট ইউনিট ঃ যে অংশে কম্পিউটারের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা নির্দেশ দেওয়া হয় সেই অংশকে বলা হয় ইনপুট আর যে ডিভাইস বা যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য বা নির্দেশ প্রদান তাকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস। যেমন কীবোর্ড, মাউস ইত্যাদি।

আউটপুট ইউনিট ঃ কম্পিউটারে যে সকল যন্ত্র বা ডিভাইস দিয়ে ফলাফল প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় আউটপুট ইউনিট। সাধারণত মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি ডিভাইসগুলিকে আউটপুট ডিভাইস বলে।

সফটওয়্যার ঃ কম্পিউটার নিজের থেকে কোনও কাজ করতে পারে না। সে এক একটি নিদির্ষ্ট কার্যক্রম অনুসরণ করে কোনও কাজ সম্পন্ন করে এবং ফলাফল জানিয়ে দেয় ক্রমে ক্রমে কী কী কাজ করতে হবে, তা কম্পিউটারকে জানাতে হয় তারই কোন ভাষা ব্যবহার করে। এই নির্দেশাবলী বা কার্যক্রমকে আমরা কম্পিউটারের পরিভাষায় প্রোগ্রাম ব লি। প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম থাকে।

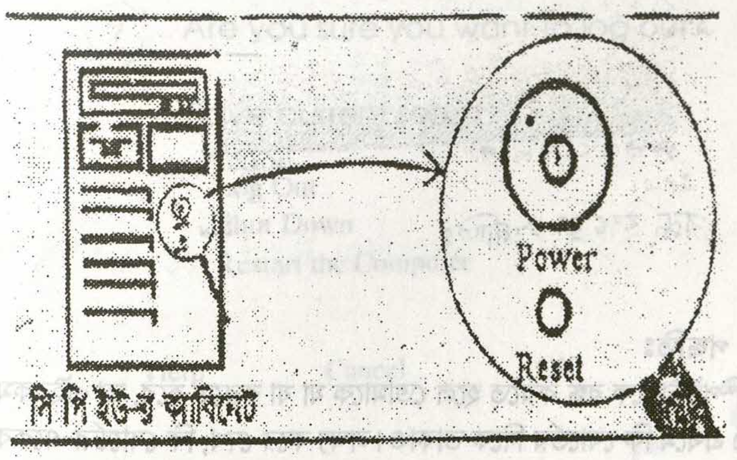
বিভিন্ন প্রোগ্রামের সুনির্দিষ্ট সমন্বয়কেই সফটওয়্যার বলা হয়। যেমন - এম এস ওয়ার্ড ইত্যাদি।

অপারেটিং সিস্টেমঃ অপারেটিং সিস্টেম হলো মূলত একটি সিস্টেম সফটওয়্যার, যে সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। কম্পিউটারের সামর্থকে কাজে লাগিয়ে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম চালনা করে, তাহই হলো অপারেটিং সিস্টেম।

কম্পিউটার চালু ও বন্ধ করার পদ্ধতি

চালু করার পদ্ধতি

আগেই আমরা জেনেছি যে, কম্পিউটার চালাতে বিদ্যুৎ লাগে। আমরা ধরে নিচ্ছি, কম্পিউটারের সমস্ত যন্ত্রাংশ পরস্পরের সঙ্গে সঠিকভাবে যুক্ত রয়েছে। এখন কম্পিউটারে সি পি ইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বলে যে যন্ত্রাংশ আছে, তার সঙ্গে প্লাগসহ বিদ্যুৎবাহী তার যুক্ত থাকে। প্রথমে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এমন কোন প্লাগ পয়েন্টে প্লাগটি ঢুকিয়ে প্লাগ পয়েন্টের সুইচটিকে অন বা চালু করে দিতে হবে। এবার লক্ষ্য করে দেখ, সেন্টাল প্রসেসিং ইউনিটে পাওয়ার (Power) নামে একটি সুইচ রয়েছে। সেটি অন করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে তোমার কম্পিউটার চালু হয়ে যাবে।



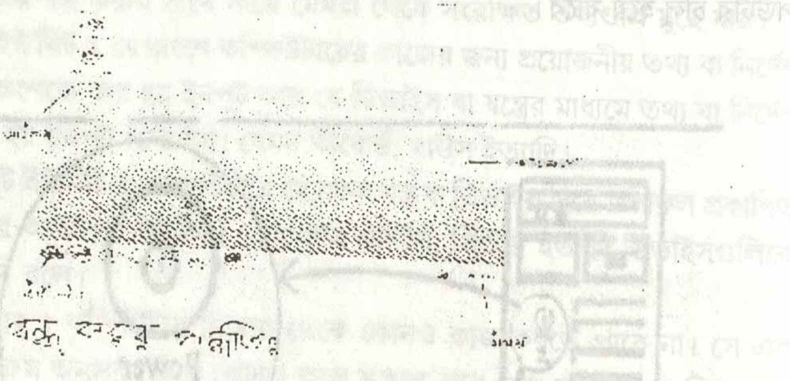
15995

এখন প্রশ্ন হলো, তুমি কীভাবে বুঝবে যে, তোমর কম্পিউটার চালু হয়ে গেছে। তোমার কম্পিউটারের মনিটরের পর্দার মাধ্যমে তুমি তা বুঝতে পারবে। মনিটারের পাওয়ার (Power) নামে একটি সুইচ থাকে, সেটি আগে থেকে অন করা থাকতে পারে, না থাকলে সেটিকে অন করে দাও। তখন কম্পিউটার একটি সূচনা প্রক্রিয়া (Starting Process)-র মধ্য দিয়ে যাবে, যার প্রতিফলন তুমি মনিটরের পর্দায় দেখতে পাবে।

এই প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার নিজেই তার সিস্টেম (System) বা ব্যবস্থার সেট আপ (Set Up) বা কাঠামোর পরীক্ষা করে নেয় এবং এই সময়ে মনিটরের পর্দায় কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সর্ম্পকে কিছু তথ্য দ্রুত ফুটে ওঠে ও মিলিয়ে যায়। একেই বলে বুটিং।

এখনকার বেশিরভাগ কম্পিউটারে লিনাক্স নামক অপারেটিং সিস্টেম যুক্ত থাকে। বুটিং শেষ হলে কম্পিউটারের পর্দায় লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের নাম, ভার্সন ও লোগো বা প্রতীকসহ মনিটর এর পর্দায় ফুটে ওঠবে।

তারপর দেখতে পাবে একটি নতুন ছবি , মনিটরের পর্দায় একেবারে নিচের বাঁদিকে লাল টুপি বা (Start) এবং নিচের ডানদিকে সময় ফুটে উঠেছে, আর পর্দার বাকি অংশে বিভিন্ন আইকন (Icon) বা অবয়ব চিহ্ন ফুটে উঠেছে আলাদা আলাদা নাম দিয়ে।



বন্ধ করার পদ্ধতিঃ

কম্পিউটারকে বন্ধ করতে হলে তোমাকে যা যা করতে হবে, তা এইরকমঃ

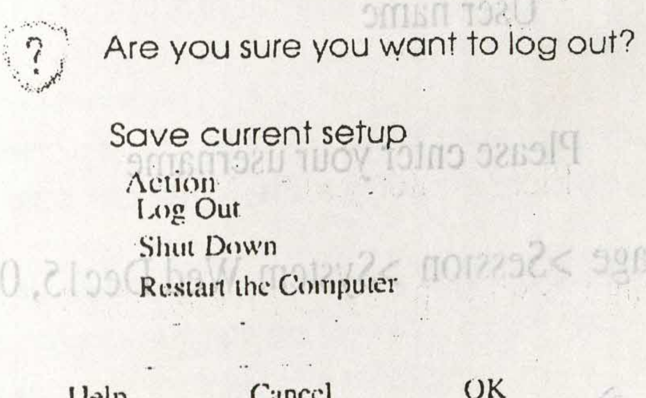
১) প্রথমে কি বোর্ডের দিকে তাকাও। লক্ষ্য করে দেখ, কি বোর্ডের একেবারে নিচের সারিতে বাঁদিক থেকে প্রথমে রয়েছে কন্ট্রোল লেখা একটি বাটন, তার পাশেই যে বাটনটি রয়েছে, সেই দ্বিতীয় বাটনটিকে স্টার্ট বাটনও বলা হয়ে থাকে, আবার উইণ্ডোজ বাটনও বলা হয়।

২) এই বাটনটি একবার টেপো। দেখবে, কম্পিউটারের মনিটারের পর্দায় স্টার্ট শব্দটির উপরে একটি তালিকা খুলে গেল।

৩) এবার কি বোর্ডের নিচের সারি বরাবর ডানদিকে মাঝামাঝি জায়গায় সরে এস। উপরে, নিচে, ডানদিকে এবং বাঁদিকে মুখযুক্ত চারটি তীর চিহ্নের আলাদা আলাদা বাটন রয়েছে। এই চিহ্নগুলি হলো যথাক্রমে ঃ ⊡ ⊡ ⊟ ⊟

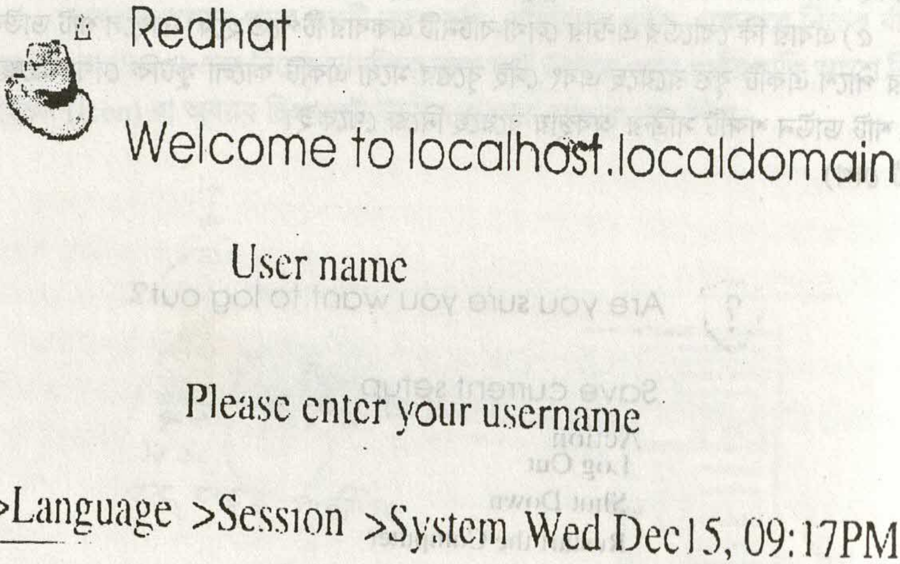
৪) যে বাটনটিতে তীর চিহ্নের মুখ উপরের দিকে, সেটিকে একবার টিপে দাও। মনিটরের পর্দার দিকে তাকিয়ে দেখ, স্টার্ট শব্দটির উপরে যে তালিকা খোলা আছে, তার একেবারে নিচে শাট ডাউন (Shut Down) শব্দটি রয়েছে এবং তুমি ঐ বাটনটি টেপার সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দটি ঘিরে একটি রঙিন চর্তুভূজ বা আনুভূমিক স্তম্ভ তৈরী হয়েছে।

৫) এবার কি বোর্ডের এণ্টার লেখা বাটনটি একবার টিপতে হবে। তাহলে শাট ডাউন শব্দটির পাশে একটি বৃত্ত রয়েছে এবং সেই বৃত্তের মধ্যে একটি কালো ফুটকি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ শাট ডাউন শব্দটি সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে নিজে থেকেই।
(ছবিটি দেখ)



এবার তোমাকে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কম্পিউটার তার মনিটরের পর্দায় বার্তার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবে যে, এখুনি তোমার কম্পিউটার বন্ধ করা নিরাপদ নয়। তোমাকে কম্পিউটারের পর্দা কালো হওয়া পর্যন্ত্য অপেক্ষা করতে হবে।

এরপর ইউ পি এস এর সুইচ বন্ধ করতে হবে, এবং মূল প্লাগ পয়েন্টের অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগের সুইচটি অফ বা বন্ধ করে দিতে হবে। আবার যখন চালু করবে তখন তোমাকে প্রথমে মূল প্লাগ পয়েন্ট এর অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগের সুইচটি অন বা চালু করতে হবে, তারপর ইউ পি এস এর সুইচটি চালু করতে হবে, এবং সবশেষে সি পি ইউ এর সুইচটি অন বা চালু করতে হবে।



অনুশীলনী

১) C.P.U -র সম্পূর্ণ নাম কি?

২) C.P.U. -র বিভিন্ন অংশগুলি কি কি?

৩) সম্পূর্ণ নাম বল-

ক) CU খ) ALU

৪) কম্পিউটার মেমরী বা স্মৃতি কয়প্রকার ও কি কি।

৫) আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৮) সফটওয়্যার কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৯) অপারেটিং সিস্টেমের কাজ কি?

চতুর্থ অধ্যায়

সফটওয়্যার সম্পর্কে ধারণা

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে

- লিনাক্স
- জিম্প
- পেইন্ট
- জি- এডিট
- ক্যালকুলেটর

লিনাক্স বা লাইনাকস (Linux)

লিনাক্স বা লাইনাক্স একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম। লাইনাস টরভাল্ডস(Linus Torvalds) এর জন্মদাতা হিসাবে প্রখ্যাত।

ব্যবহারকারী লিনাক্সের প্রয়োজনমতো প্রতিলিপি তৈরী করতে ও বিতরণ করতে পারে। যতগুলি খুশি কম্পিউটারে এর ব্যবহার করা যায়।

আমরা আমাদের কম্পিউটারে রেডহ্যাট লিনাক্স ব্যবহার করবো। রেডহ্যাট লিনাক্সে কে ডি ই (KDE) ও জিনোম (GNOME) এই দুই প্রকার ইন্টারফেস আছে। ফলে আমরা দুই ধরণের ডেক্স টপ পাই। তবে আমরা জিনোম ইন্টারফেসই আমাদের কাজ করবো এখানে। অবশ্য চাইলে আমরা কে ডি ই তে ও পরিবর্তন করে নিতে পারি। এই দুই ডেক্সটপের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই।

লিনাক্সে কোন কম্পিউটার থাকলে সেটি চালু করার পর ব্যবহারকারীর নাম ও পাসওয়ার্ড জানতে চাইবে। কেবলমাত্র পূর্বনির্ধারিত নাম ও পাসওয়ার্ড সঠিকভাবে টাইপ করতে পারলে তবেই পরবর্তী পর্যয়ে যাওয়া যাবে এবং কম্পিউটারের পর্দাতে জিনোম ডেক্স টপ দেখা যাবে।

<u>লিনাক্স ব্যবহারের উপযোগিতা</u>

১) এই অপারেটিং সিস্টেমটি বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ফলে ইহা বহুমাত্রায় ব্যবহার করা যায়।

২) যেহেতু ইহা জি এন ইউ (General Public License) এর অর্ন্তগত ফলে লিনাক্স নিয়ে কোন একচেটিয়া অধিকার সম্ভব নয়।

৩) অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমে কোন পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকলে তা মেনে নিতে হয়, কারণ তা একমাত্র ঠিক করতে পারে উৎপাদনকারী সংস্থা কিন্তু লিনাক্সে এরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

৪) যেহেতু বিশ্বের প্রযুক্তিবিদরা প্রতিনিয়ত লিনাক্সে বিভিন্ন পরিবর্তন ও পরিমার্জন করছেন সেহেতু বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি দ্রুত নিস্পত্তি হয়, এর জন্য কোন একটি সংস্থার সময়, সুযোগ ও সামর্থ্য বা দয়ার উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয় না।

জিম্প(GIMP)

আমরা যেমন সাদা পাতায় পেনসিল দিয়ে বা রং তুলি দিয়ে কিছু আঁকতে পারি বা রং করতে পারি, কম্পিউটারের সাদা পর্দাতেও তা আমরা করতে পারি জিম্প এর ব্যবহার করে। জিম্প এর পুরো নাম হলো জি এন ইউ ইমেজ ম্যানিপুলেশন প্রোগ্রাম (GNU Image Manipulation Program)। ইহার সাহায্যে ছবি তৈরী করা যায়, এডিট করা যায়, তাছাড়া ছোট ছোট অ্যানিমেটেড ছবিও তৈরী করা যায়।

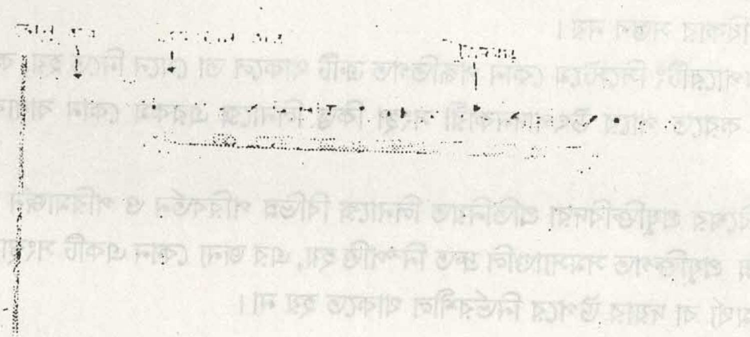
জিম্প খোলার জন্য তোমাকে যা যা করতে হবে-

১) মাউসের সাহায্যে মাউস পয়েন্টারটিকে প্রথমে ডেস্ক টপের উপরে কম্পিউটারের পর্দার নীচের দিকে লালটুপির উপরে নিয়ে যেতে হবে।

২) তারপরে মাউসের বাঁদিকের বোতাম একবার ক্লিক করলে একটি তালিকা খুলে যাবে, তাতে গ্রাফিক্স বলে একটি শব্দ আছে।

৩) মাউস পয়েন্টারটিকে এবার ঐ শব্দটির উপরে নিয়ে গেলে একটি তালিকা খুলে যাবে।

৪) এবার মাউস পয়েন্টারটিকে ঐ তালিকার নীচের দিকে নিয়ে আসলে 'দি জিম্প' (The GIMP) পাওয়া যাবে এবং এবার মাউসের বাঁদিকের বোতামে একবার ক্লিক করতে হবে। এবার কম্পিউটারের পর্দায় জিম্প খুলে যাবে।



জিম্পের উপকরণঃ

মেনুবার ছাড়াও ছবির উপরে মাউসের রাইট বা ডানদিকের বোতামে ক্লিক করলে অনেকগুলি কমাণ্ডসহ একটি ভাসমান তালিকা খুলে যায়, কমাণ্ডগুলির কাজ কি কি বা ব্যবহার কেন আমরা করবো-

১) আনডু (Undo) ঃ ছবির উপরে মাউসের ডানদিকের বোতামে ক্লিক করলে যে ভাসমান তালিকা পাওয়া যাবে, তাতে এডিট পাওয়া যাবে। এডিটের উপরে মাউস পয়েন্টারটিকে নিয়ে গেলে যে তালিকা খুলে যাবে তাতে আনডু কমাণ্ডটি রয়েছে। ইহার সাহায্যে তুমি ছবিটির একধাপ পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারবে।

২) রিডু (Redo) ঃ এই উপকরণটি আনডু উপকরণের ঠিক উল্টো কাজ করে, অর্থাৎ চিত্রটিকে একধাপ সামনের বা শেষে যে অবস্থায় ছিলো সেখানে ফিরিয়ে দেয়।

৩) কাট (Cut) - কাট উপকরণটির কাজ হল চিত্রের নির্বাচিত জায়গাটিকে জিম্পের ক্লিপবোর্ডে রেখে দেওয়া। আবার নির্বাচিত অংশটিকে পেষ্ট (Paste) কমাণ্ডের সাহায্যে ফিরিয়ে আনা যায়। ইহা কেবলমাত্র সক্রিয় লেয়ারটির উপরে কাজ করে।

৪) কপি (Copy)ঃ এই কমাণ্ডটি বর্তমানে সক্রিয় নির্বাচনের অংশটিকে জিম্পের ক্লিপবোর্ডে সঞ্চয় করে রাখে। আবার পেষ্ট কমাণ্ডের সাহায্যে এই অংশটিকে ব্যবহার করা যায়।

৫) পেষ্ট (Paste) - এই কমাণ্ডটি শেষ কপি বা কাট করা চিত্রের যে কোন অংশ জিম্পের ক্লিপ বোর্ড থেকে তুলে যে কোন জায়গায় রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৬) ক্লিয়ার (Clear) ঃ এই কমাণ্ডটি বর্তমানে সক্রিয় চিত্রের নির্বাচন করা যে কোন অংশকে মুছে দেয়। কিন্তু যদি চিত্রে কোন নির্বাচন করা না থাকে তবে বর্তমানে সক্রিয় লেয়ারকে সরিয়ে বা মুছে ফেলবে।

৭) ফিল (Fill) ঃ এই কমাণ্ডটি চিত্রের নির্বাচন করা জায়গা বা সক্রিয় লেয়ারকে ফিল বা রং দিয়ে পরিপূর্ণ করে। কিন্তু যদি চিত্রে কোন নির্বাচন করা না থাকে তবে সক্রিয় ব্যাকগ্রাউণ্ড বা ফোরগ্রাউণ্ড এর রং এ পূর্ণ হয়।

৮) স্ট্রোক (Stroke) ঃ নির্বাচন করা সক্রিয় ব্রাশ এর সাহায্যে লাইন আঁকা যায়।

৯) ইনভার্ট সিলেকশন (Invert Selection) ঃ এই কমাণ্ডের সাহায্যে চিত্রের বাকি অংশ নির্বাচিত হয়ে যায় বা সিলেক্ট হয়ে যায়, এবং আগের নির্বাচিত অংশটিতে কোন নির্বাচন করা থাকে না।

১০) সিলেক্ট নেম (Select Name) ঃ এই কমাণ্ডটির সাহায্যে ছবির নির্বাচিত অংশটি বাতিল হয়ে যায়।

১১) ফ্লোট সিলেকশন(Float Selection) ঃ যে কোন একটি সাধারণ নির্বাচিত এরিয়া বা জায়গা বা অংশকে ফ্লোটিং সিলেকশন বা ভাসমান নির্বাচন এ পরিবর্তিত করে।

১২) সার্পেন সিলেকশন (Sharpen Selecction) ঃ এই কমাণ্ডটির সাহায্যে তুমি কোন নির্বাচিত অংশের কিনারায় ঝাপসা বা অস্পষ্টতা দূর করতে পার।

১৩) বর্ডার সিলেকশন (Border Selection) ঃ কোন নতুন নির্বাচনের অংশকে তুমি অনেকগুলি ভাগে ভাগ করতে পার, এবং ইহাতে এই কাজের জন্য অনেকগুলি অপশন আছে।

১৪) জুম (Zoom) ঃ এই কমাণ্ডটি ব্যবহার করে তুমি কোন ছবিকে আপাতদৃষ্টিতে বর্ধিত করতে পার।

১৫) ডিসাটুরেট (Desaturate) ঃ এই কমাণ্ডটির সাহায্যে তুমি কোন সক্রিয় লেয়ার বা সিলেকশনের বা নির্বাচিত অংশকে গ্রে স্কেলএ নিয়ে যেত পার।

১৬) ইকুয়ালাইজ (Equalize) ঃ এই কমাণ্ডটির ব্যবহার করে তুমি কোন সাধারণ ছবির হাল্কা বা ডিপ/গভীরতাকে কন্ট্রোল করতে পার।

১৭) ডিলিট লেয়ার (Delete Layer) ঃ জিম্পের সক্রিয় লেয়ারকে বাতিল করা যায় এবং বাতিল লেয়ারের নিচের লেয়ারটি তখন সক্রিয় লেয়ারে পরিণত হয়।

টুলবারের উপকরণঃ

জিম্পের টুলবারে 25 টি প্রতীক রয়েছে যা ব্যবহার করে তুমি তোমার পছন্দমত ছবি আঁকতে পার-

রেকট্যাঙ্গুলার সিলেকশন (Rectangular Selection) ঃ ছবির কোন অংশকে বর্গক্ষেত্রের আকারে নির্বাচিত করা যায় ও প্রয়োজন মতো কপি বা কাট করা যায়।

ইলিপটিক্যাল সিলেকশন(Elliptical Selection) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে বৃত্তাকার অংশ নির্বাচন করা যায়।

ফ্রিহ্যাণ্ড সিলেকশন (Freehand Selection) - এই উপকরণটির সাহায্যে ছবির যে কোন অংশকে কেটে নেওয়া যায় বা তার প্রতিলিপি তৈরী করা যায় কপি বা কাট কমাণ্ড ব্যবহার করে।

ফাজি সিলেকশন (Fuzzy Selection) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে একই রঙের ছবির অংশকে পর পর নির্বাচিত বা সিলেক্ট করা যায়।

বেজিয়োর সিলেকশন (Bezier Selection) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে খাঁজ যুক্ত বা আঁকা বাঁকা অংশ নির্বাচন করা যায়।

ইন্টলিজেণ্ট সিজার (Intelligent Scissors) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে ছবির পর পর একই রং এর একই ধরণের ঝাপসা বা অস্পষ্ট অংশকে নির্বাচিত করে কেটে নেওয়া যায়।

মুভ (Move) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে ছবির নির্বাচিত কোন অংশ বা লেয়ারকে সরানো যায়।

ম্যাগনিফাই (Magnify) ঃ ছবিকে বা ছবির কোন অংশকে ছোট বা বড় করে দেখা যায়।

ক্রপ (Crop) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে ছবিকে তুমি নতুনভাবে নির্বাচিত করতে পার বা একত্রিত করতে পার।

ট্রান্স ফর্ম টুল (Transform Tool) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে তুমি চারভাবে কোন সক্রিয় লেয়ার বা নির্বাচিত অংশকে পুনরায় ঠিক করতে পার।

ফ্লিপ (Flip)ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে তুমি কোন ছবির নির্বাচিত অংশকে বা লেয়ারকে অনুভূমিক বা উলম্ব করতে পার।

টেক্সট টুল (Text Tool)ঃ ছবির যে কোন অংশে কিছু লিখবার জন্য তুমি এই উপকরণটির ব্যবহার করতে পার।

কালার পিকার (Colour Picker)ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে তুমি ছবিতে কি রং করতে চাও তা বেছে নিতে পার।

বাকেট ফিল (Bucket Fill)ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে ছবির কোন অংশকে রং দিয়ে ভরাট করতে পার।

ব্লেণ্ড (Blend) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে ছবির সক্রিয় ফোরগ্রাউণ্ড বা ব্যাকগ্রাউণ্ড এর রং কে ক্রমশ হাল্কা থেকে গভীর বা গভীর থেকে হাল্কা করতে পার।

পেনসিল (Pencil) ঃ পেনসিলকে বেছে নিয়ে কম্পিউটারের পর্দায় ছবি আঁকার নির্দিষ্ট অংশে ইচ্ছেমতন ছবি আঁকা বা দাগ টানা যায়।

পেইন্ট ব্রাশ (Paint Brush) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে ঝাপসা বা অস্পষ্ট দাগ দেওয়া যায়।

ইরেজার (Eraser) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে ছবির কোন অংশ মুছে ফেলা যায়।

এয়ার ব্রাশ (Air Brush) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে ছবির কোন অংশে বিন্দু বিন্দু রং ছড়িয়ে ভরাট করা যায়।

কোলন (Clone) ঃ সক্রিয় ছবিটির উৎসস্থান থেকে কপি করে প্রতিলিপি তৈরী করা যায়।

কনভোলভার (Convolver) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে তুমি সক্রিয় ব্রাশটি দিয়ে ছবির কিনারা বা খাঁজকে স্পষ্ট করতে পার।

ইংক (Ink) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে ছবি আঁকার নির্বাচিত স্থানে শক্ত ব্রাশ দিয়ে দাগ দেওয়া যায় এবং ব্রাশটিকে প্রয়োজন মতন আকার আকৃতি বা কোন ও পরিবর্তন করা যায়।

ডজ অর বার্ণ (Dodge or Burn) ঃ এই উপকরণটিকে ব্যবহার করে তুমি বর্তমানে সক্রিয় ব্রাশ দিয়ে ছবির রংকে হাল্কা বা গভীর করতে পার।

স্মাজ (Smudge) ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে সক্রিয় ব্রাশটি দিয়ে ছবিতে ধোঁয়াশা রং করতে পার।

মেজার ডিসট্যান্স (Mesure distance) ঃ এই উপকরণ সাহায্যে ছবির একটি বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

নতুন ফাইল তৈরীঃ

নিউ ইমেজঃ মাউসের সাহায্যে ফাইল মেনুতে ক্লিক কর। একটি তালিকা খুলে যাবে, সেখানে নিউতে (New) ক্লিক করলে ছবি আঁকার জন্য নতুন সাদা জায়গা কম্পিউটারের পর্দায় ফুটে উঠবে যা নিউ ইমেজ (New Image)।

ফাইল খোলাঃ

মাউসের সাহায্যে ফাইলে ক্লিক করলে, একটি তালিকা খুলে যাবে, সেখানে ওপেন মেনুতে ক্লিক করলে ওপেন ডায়লগ বক্স দেখাবে। যার সাহায্যে তুমি জিম্পে কোন ছবিকে খুলে দেখতে পার বা প্রয়োজনমত ঠিক বা পরিবর্তন করতে পার।

ফাইল বা ছবি সংরক্ষণ- সেভ বা সেভ অ্যাজ কমাণ্ডের সাহায্যে তুমি এই কাজটি করতে পার। তোমার ছবি তৈরী করা শেষ হয়ে গেলে বা অসম্পূর্ণ ছবি পরে করবে ঠিক করলে তা তুমি সংরক্ষণ বা সঞ্চিত করে রাখতে পার। জিম্পের নিজস্ব এক্সটেনশন, যা তোমাকে লিখতে হবে না, জিম্প নিজের থেকে নিয়ে নেয় বা তৈরী করে তা হল পি এন জি (.PNG), এছাড়া ছবির সঞ্চয়ের জন্য অন্যান্য যা যা এক্সটেনশন জিম্পে আছে তা তুমি ব্যবহার করতে পার।

ক্লোজ (Close) ঃ

এই কমাণ্ডটির সাহায্যে ছবি আঁকার সক্রিয় উইণ্ডোটি বা জায়গাটি বন্ধ করা যায়।

কুইট (Quit) ঃ

এই কমাণ্ডটির সাহায্যে টুলবক্স এবং ছবি আঁকার জায়গা সহ সম্পূর্ণ জিম্প বন্ধ করা যায়।



পেইন্ট প্রোগ্রাম

পেইন্ট শব্দটির অর্থ ছবি আঁকা। আমরা পাতায় কিছু এঁকে তা রং করি। আবার রঙিন পেনসিল বা রং তুলি দিয়েও তা আঁকতে পারি। কম্পিউটারের পর্দাতেও সেরকমের ছবি আঁকা সম্ভব। এই সকল ছবি পেইন্ট ব্যবহার করে আঁকা যায়।

সুতরাং পেইন্ট প্রোগ্রাম এমন একটি প্রোগ্রাম, যার সাহায্যে কম্পিউটারের পর্দায় ছবি আঁকা যায়।

কাজ করার সুবিধার জন্য আমরা কম্পিউটারে জিনোম ডেক্সটপে পেইন্ট প্রোগ্রাম নিয়ে আসতে পারি নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে। পেইন্ট প্রোগ্রাম পেইন্ট নামেও পরিচিত।

১) ডেক্স টপের স্টার্ট হিয়ার (Start Here) আইকনের উপরে মাউসের সাহায্যে রাইট ক্লিক করে একটি তালিকা পাব। তাতে ওপেন এ ক্লিক করলে একটি উইণ্ডো খুলে যাবে।

২) অ্যাপ্লিকেশন আইকনটি সিলেক্ট করে, ওপেন করে মাউস এর সাহায্যে ডবল ক্লিক করলে, একটি উইণ্ডো খুলে যাবে।

৩) এক্সটা আইকনটি সিলেক্ট কর ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ওপেন কর বা খোলো, একটি উইণ্ডো খুলে যাবে।

৪) গ্রাফিক্ট আইকনটি সিলেক্ট কর ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে খোলো, একটি উইণ্ডো খুলে যাবে।

এবার তুমি পেইন্ট প্রোগ্রামটিকে দেখতে পাবে। পেইন্ট প্রোগ্রামটি মাউসের পয়েন্টার এর সাহায্যে টেনে এনে ডেক্স টপের উপরে ছেড়ে দাও।

ডেক্স টপের উপরে পেইন্ট প্রোগ্রামের আইকনটিকে দেখতে পাবে।

পেইন্ট প্রোগ্রাম খোলার পদ্ধতিঃ

পেইন্ট প্রোগ্রাম আইকনটির উপরে ডবল ক্লিক কর বা রাইট ক্লিক কর। একটি তালিকা দেখতে পাবে, ওপেন সিলেক্ট কর ও বাঁদিকের মাউসের বোতামে ক্লিক কর।

ডেক্স টপের উপরে তোমার আঁকার জন্য পেইন্ট প্রোগ্রামটি খুলে যাবে।

পেইন্ট প্রোগ্রাম আইকনটির উপরে মাউসের সাহায্যে রাইট ক্লিক করলে একটি তালিকা দেখাবে, সেখানে স্ট্রেচ দেখতে পাবে, এই কমাণ্ডটির সাহায্যে আইকনটিকে তুমি ছোট বড় করতে পারবে।

টুলবারের উপকরণঃ

এবার আমরা জেনে নেবো পেইন্ট প্রোগ্রামের টুলবারে কি কি উপকরণ আছে ও উপকরণগুলি ব্যবহার করে কি কি কাজ করা যায়। টুলবারে প্রধানত নয়টি উপকরণ আছে।

ইলিপস ঃ এই উপকরণটির সাহায্যে তুমি ডিম্বাকৃতি উপবৃত্ত আঁকতে পারবে।

সার্কেল- এই উপকরণটির সাহায্যে তুমি বৃত্ত আঁকতে পারবে।

পেন- এই উপকরণটি ব্যবহার করে তুমি নিজের ইচ্ছেমতন দাগ দিতে বা আঁকতে পারবে।

— লাইন- এই উপকরণটি ব্যবহার করে তুমি সরলরেখা আঁকতে পারবে।

রেক্টাঙ্গেল- এই উপকরণটি ব্যবহার করে তুমি বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র আঁকতে পারবে।

রাউণ্ড অ্যাঙ্গেল-এই উপকরণটি ব্যবহার করে তুমি গোলাকার কিনারার বর্গক্ষেত্র আঁকতে পারবে।

স্প্রে ক্যান- এই উপকরণটি ব্যবহার করে তুমি কোন ছবির অংশে রং ছিটিয়ে দিতে পার বিন্দু বিন্দু করে।

A টেক্সট- এই উপকরণটি ব্যবহার করে তুমি ছবির যে কোন অংশে বাদিকের মাউসের বোতামে ক্লিক করে লেখা শুরু করতে পার।

এরিয়া সিলেক্ট- এই উপকরণটি ব্যবহার করে তুমি ছবির যে কোন অংশ নির্বাচন করে কাট বা কপি করতে পার। আবার প্রয়োজন মতন পেষ্ট করাও সম্ভব।

নতুন ফাইল তৈরী করা, পুরানো ফাইল খোলা ও সংরক্ষণ করার পদ্ধতিঃ

কম্পিউটারের পর্দায় যে পেইন্ট প্রোগ্রামটি খোলা আছে, তার উপরের দিকে মেনুবারে ফাইল (File) নামক একটি শব্দ আছে। মাউসের সাহায্যে মাউস পয়েন্টারটি ঐ শব্দটির উপরে নিয়ে গিয়ে ঐ শব্দটির উপরে নিয়ে গিয়ে মাউসের বাঁদিকের বোতামে ক্লিক করলে একটি তালিকা খুলে যাবে, ঐ তালিকায় নিউ বলে একটি শব্দ আছে। তাতে ক্লিক করলে মাউসের সাহায্যে পেইন্ট প্রোগ্রামের (Paint Program)নতুন উইণ্ডো তোমার আঁকার জন্য খুলে যাবে।

কোন সংরক্ষিত ফাইলকে দেখার জন্য একইভাবে মাউসের সাহায্যে মাউস পয়েন্টারটিকে ফাইল শব্দটির উপরে নিয়ে যাবে ও মাউসের বাঁদিকের বোতামে ক্লিক করবে। একটি তালিকা খুলে যাবে, তাতে ওপেন বলে একটি শব্দ আছে। এই শব্দটির উপরে মাউস পয়েন্টারটি নিয়ে গিয়ে মাউসের বাঁদিকের বোতামে ক্লিক করলে একটি উইণ্ডো খুলে যাবে, তাতে ফাইলের নাম লেখার জায়গা আছে, অথবা মাউসের সাহায্যে তুমি এই উইণ্ডো থেকে তোমার প্রয়োজনীয় ফাইলের নামটি খুঁজে নিতে পার। এবার ও কে (OK) বাটনে ক্লিক করলে, ফাইলটি তোমার সামনে খুলে যাবে।

তোমার কম্পিউটারের পর্দায় পেইন্ট প্রোগ্রাম নামক যে উইণ্ডোটি খোলা আছে তার উপরের দিকে মেনুবারে ফাইল (File) বলে একটি শব্দ আছে। মাউস পয়েন্টার এর সাহায্যে এই শব্দটির উপরে ক্লিক করলে একটি তালিকা খুলে যাবে, তাতে সেভ বলে যে শব্দটি আছে, তার উপরে মাউস পয়েন্টারটিকে নিয়ে গিয়ে বাঁদিকের বোতামে ক্লিক করলে একটি উইণ্ডো খুলে যাবে। সেখানে ফাইল নাম লিখে কিবোর্ড থেকে এণ্টার বোতামে চাপ দিলে অথবা সেভ বোতামে বাঁদিকের মাউসের বোতামের সাহায্যে চাপ দিলে বা ক্লিক করলে সাথে সাথে তোমার ফাইলটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

জি এডিট

জি এডিট ব্যবহার করে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের নথি বা প্রতিবেদন তৈরী করা যায়। সাধারণ লেখার সময় আমরা যে খাতা ব্যবহার করি, জি এডিটকে তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। খাতায় পেনসিল বা কলম দিয়ে লিখতে হয়। আর জি এডিটে কিছু লেখার দরকার হলে কি বোর্ডের সাহায্য নিতে হয়।

জি এডিটের সাহায্যে নথি বা প্রতিবেদন তৈরী করার সময় কি বোর্ডের মাধ্যমে যা টাইপ করা যায়, সেখানে নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা সম্ভব। এমনকি বাঁকা, মোটা বা সরু হরফে টাইপ করা যায়। টাইপ করার সময়ে একটি অনুচ্ছেদ শেষ করে পরের অনুচ্ছেদে যেতে হলে কিবোর্ডে এণ্টার লেখা বাটনটি চাপতে হবে।

জি এডিট খুলবে কিভাবেঃ

ডেস্কটপের নীচে একেবারে বাঁদিকের কোনাতে যে লাল টুপিটি রয়েছে মাউস পয়েণ্টারটি সেখানে নিয়ে যাও ও বাঁদিকের মাউসের বোতামে ক্লিক কর। একটি তালিকা খুলে যাবে। ঐ তালিকার একেবারে উপরের দিকে অ্যাক্সেসরিস শব্দটির উপরে মাউস পয়েণ্টারটিকে নিয়ে গিয়ে ক্লিক করলে পাশে আর একটি তালিকা খুলে যাবে। সেখানে জি এডিট নামক একটি সহায়িকা রয়েছে।

এবার মাউস পয়েণ্টারটিকে ঐ নামের উপরে নিয়ে গিয়ে মাউসের বাঁদিকের বোতামে একবার ক্লিক করলেই তোমার কম্পিউটারের পর্দায় জি এডিট নামক একটি উইণ্ডো খুলে যাবে

জি এডিটের সাহায্যে নথি তৈরীর পদ্ধতিঃ

জি এডিটে নথি বা প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য কী বোর্ডের ব্যবহার করতে হবে। জি এডিট খুললে তার উইণ্ডোটির মধ্যে একটি সাদা অংশ দেখতে পাওয়া যাবে। তুমি কিবোর্ডের সাহায্যে যা টাইপ করবে তা ঐ অংশে ফুটে উঠবে।

সাদা অংশটির উপরে বাঁদিকে একটি ছোট রেখাকৃতি সংকেত দেখতে পাওয়া যায়, কম্পিউটারের পরিভাষায় এটিকে কারসার বলে। তুমি যা টাইপ করবে, তা শুরু হবে কারসারটির অবস্থান থেকেই। অবশ্য তুমি চাইলে কিবোর্ডের নিচের সারিতে অবস্থিত স্পেশ বাটনটি টিপে কারসারটিকে ডানদিকে এবং এণ্টার বাটনটি টিপে কারসারটিকে নিচের দিকে তোমার পছন্দের জায়গায় সরিয়ে নিতে পার।

সাধারণত কিবোর্ডের সাহায্যে যখন কোন অক্ষর টাইপ করা হয় তখন ইংরাজীর ছোট হাতের অক্ষর কম্পিউটারের পর্দায় দেখা যায়। বড় হাতের কোন অক্ষর টাইপ করতে হলে কিবোর্ডের শিফট (Shift) বাটনটি চেপে রেখে ঐ অক্ষরের নির্দিষ্ট বাটনটি চাপতে হবে। আবার কি বোর্ডের বেশ কিছু বাটনে সংকেত থাকে। সেক্ষেত্রে উপরের সংকেতটি ব্যবহার করতে হলে কি বোর্ডের শিফট বাটনটি চেপে রেখে সংশ্লিষ্ট বাটনটি টিপতে হবে।

জি এডিটে নথি সংরক্ষণের পদ্ধতিঃ

তোমার কম্পিউটারের পর্দায় জি এডিট নামক যে উইণ্ডোটি খোলা আছে, তার উপরের দিকে মেনুবারে ফাইল (File) বলে একটি শব্দ আছে। মাউস পয়েণ্টারটিকে সেই শব্দটির উপরে নিয়ে গিয়ে বাঁদিকের বোতামে ক্লিক করলে একটি তালিকা খুলে যাবে। এবার ঐ তালিকায় সেভ (Save) বলে যে শব্দটি আছে, তার উপরে মাউস পয়েণ্টারটি নিয়ে গিয়ে মাউসের বাঁদিকের বোতামে ক্লিক করলে একটি উইণ্ডো খুলবে।

এবার ঐ উইণ্ডোটিতে ফাইলের নাম লেখার জায়গায় তোমার পছন্দমতন নাম কিবোর্ডের সাহায্যে টাইপ কর।

এরপর কিবোর্ডের এণ্টার বাটনটিতে একবার চাপ দাও বা ঐ উইণ্ডোটিতে সেভ বাটনটিতে মাউস এর সাহায্যে একবার ক্লিক কর। তোমার তৈরী নথি বা প্রতিবেদন সাথে সাথে কম্পিউটারে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

সংরক্ষিত ফাইল দেখার পদ্ধতি

জি এডিট উইণ্ডোটির মেনুবারের মধ্যে অবস্থিত ফাইল নামক মেনুতে পয়েণ্টার এর সাহায্যে একবার ক্লিক করলে একটি তালিকা খুলবে তাতে ওপেন (Open) নামক একটি শব্দ পাবে। এই শব্দটির উপরে পয়েণ্টারটি রেখে মাউসের বাঁদিকের বোতামে একবার ক্লিক করলে একটি উইণ্ডো খুলে যাবে।

ফাইলের নাম লেখার জায়গাতে ফাইলের নামটি লিখে ফেল অথবা মাউস পয়েণ্টার এর সাহায্যে উইণ্ডোটি থেকে তোমার প্রয়োজনীয় ফাইলটি বেছে নাও। বাছার পর মাউসের বাঁদিকে বোতামে একবার ক্লিক কর। এবার ওপেন বা OK শব্দটির উপরে মাউস পয়েণ্টারটি রেখে একবার ক্লিক কর, বা কিবোর্ডের এণ্টার বাটনটি একবার চেপে দাও।

জি এডিটে নতুন ফাইল তৈরীর পদ্ধতি

যখনই কম্পিউটারের পর্দায় জি এডিট খোলা হয়, তখনই জি এডিট একটি নতুন ফাইল তৈরীর সুযোগ করে দেয়। এখন ধরা যাক, তুমি একটি নতুন ফাইল তৈরী করতে চাও, পুরানো ফাইলটি বন্ধ করে। বন্ধ করার জন্য তোমাকে মেনুবার থেকে ফাইলে গিয়ে যে তালিকা পাবে তাতে ক্লোজ (Close) নামক একটি শব্দ পাবে, এই শব্দটির উপরে মাউস পয়েণ্টারটিকে রেখে বাঁদিকের মাউসের বোতামে একবার ক্লিক করলেই ফাইলটি বন্ধ হয়ে যাবে।

এবার যদি আর একটি নতুন ফাইল খুলতে চাও, তাহলে আগের মতই মেনুবার থেকে ফাইল (File) শব্দটির উপরে মাউসের পয়েণ্টারটিকে নিয়ে গিয়ে বাঁদিকের বোতামে একবার ক্লিক করলে একটি তালিকা খুলবে, সেখানে নিউ (New) শব্দটি পাবে, এর উপরে মাউস পয়েণ্টারটিকে নিয়ে গিয়ে মাউসের বাঁদিকের বোতামে একবার ক্লিক করলেই একটি নতুন উইণ্ডো খুলে যাবে আনটাইটল নাম দিয়ে তোমার নতুন নথি তৈরীর জন্য।

ক্যালকুলেটর

আমরা জানি, নিজে লিখে যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ করা যায়, তেমনই যন্ত্রের সাহায্যেও এগুলি করা যেতে পারে। যে যন্ত্রটির সাহায্যে নিজের মেধাকে ব্যবহার না করেও যোগ, বিযোগ, গুণ বা ভাগ করা যায়, সেই যন্ত্রটির নাম ক্যালকুলেটর। কম্পিউটারেও ক্যালকুলেটর ব্যাবহারের সুযোগ রয়েছে।

সাধারণত কম্পিউটারে দু'ধরনের ক্যালকুলেটর থাকে, স্ট্যান্ডার্ড ক্যালকুলেটর ও সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর। স্ট্যান্ডার্ড ক্যালকুলেটরে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গমূল, শতাংশ ও অন্যোন্যক নির্ণয়ের সুযোগ থাকে। সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে এগুলির সঙ্গে আরও কিছু উঁচুমানের সমাধানের সুযোগ থাকে।

ক্যালকুলেটর খোলার পদ্ধতি

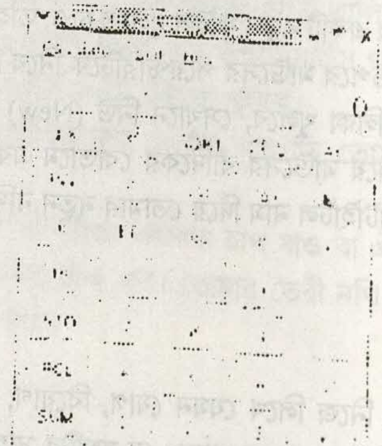
কম্পিউটারে যে ক্যালকুলেটর থাকে, তাকে একটি সহায়িকা বলা হয়ে থাকে। এটিকে খোলার নিয়ম জি এডিট এর মতোই।

১) প্রথমে তোমার কম্পিউটারের পর্দায় নিচের বাঁ দিকে যেখানে লাল টুপিটি রয়েছে, মাউসের সাহায্যে মাউস পয়েন্টারটিকে সেখানে নিয়ে যাও।

২) তারপর মাউসের বাঁ দিকের বোতামে একবার ক্লিক কর। তাকিয়ে দেখ, তোমার কম্পিউটারের পর্দায় লাল টুপিটির উপরে একটি তালিকা খুলে গেছে।

৩) ঐ তালিকার একেবারে উপরের দিকে অ্যাক্সেসরিস শব্দটির উপরে মাউস পয়েন্টারটিকে নিয়ে গিয়ে মাউসের বাঁদিকের বোতামে একবার ক্লিক করলেই পাশে আর একটি তালিকা খুলে যাবে।

৪) সেখানে একদম প্রথমেই ক্যালকুলেটর শব্দটিকে দেখতে পাওয়া যাবে। মাউস পয়েন্টারটিকে এই শব্দটির উপরে নিয়ে গিয়ে বাঁদিকের বোতামে একবার চাপ দিলেই কম্পিউটারের পর্দায় জিনোম ক্যালকুলেটরকে পাওয়া যাবে।



ক্যালকুলেটরে অংক করার পদ্ধতি

ধরা যাক, তুমি 856 -কে 73 দিয়ে গুন করতে চাও। তার জন্য প্রথমে মাউসের সাহায্যে মাউস পয়েন্টারকে ক্যালকুলেটরের উইন্ডোর ভিতরে নিয়ে যাও এবং সেখানে 8, 5 ও 6 সংখ্যা তিনটির উপরে মাউস পয়েন্টারকে পর পর রেখে মাউসের বাঁদিকের বোতামে একবার করে ক্লিক কর। এবার মাউস পয়েন্টারকে গুন (×) চিহ্নের উপরে নিয়ে গিয়ে মাউসের বাঁদিকের বোতামে একবার ক্লিক করতে হবে। তার পর 7 ও 3 সংখ্যা দুটির উপরে মাউস পয়েন্টারকে পর পর নিয়ে গিয়ে মাউসের বাঁদিকের বোতামে একবার করে ক্লিক কর। সব শেষে সমান সমান (=) চিহ্নের উপরে মাউস পয়েন্টারকে নিয়ে গিয়ে মাউসে ক্লিক করতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড ক্যালকুলেটরের উইন্ডোর উপরের দিকে একটি আয়তাকার জায়গা থাকে, যেখানে এই গণনা দেখা যায়। সেখানেই তুমি গুনফল হিসাবে 62488 সংখ্যাটিকে দেখতে পাবে। তার আগে 856 ও 73 সংখ্যা দু'টিকেও ঐ জায়গায় দেখা যাবে।

এই ভাবে তুমি যোগ, বিয়োগ বা ভাগও করতে পার। আবার ধরা যাক 256 -এর বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে। একই ভবে মাউস পয়েন্টারকে ব্যবহার করে 256 লিখতে হবে, তার পরে ক্যালকুলেটরের উইন্ডোতে এস কিউ আর টি (sqrt) শব্দটির উপরে ক্লিক করতে হবে। গণনার ফলাফল দেখানোর জায়গায় ফুটে উঠবে 16 সংখ্যাটি। কোনও সংখ্যার শতাংশ বা অন্যোন্যক নির্ণয় করার পদ্ধতিও একই।

অনুশীলনী

১) লিনাক্স -এ কতরকমের ডেক্স টপ পাওয়া যায়? লিনাক্স ব্যবহারের উপযোগিতা কি?
২) জিম্প- এর পুরো নাম কি ? জিম্পের সাহায্যে কি কি কাজ করা যায়?
৩) জিম্পের বিভিন্ন উপকরণগুলির নাম ও তাদের কাজ বল?
৪) পেইন্ট প্রোগ্রামের বিভিন্ন টুলবারের নাম বল।
৫) জি-এডিটের কাজ কি? জি-এডিটে কিভবে তুমি তোমার নথি সংরক্ষণ করবে?
৬) ক্যালকুলেটারের সাহায্যে তুমি কিভবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারেবে?

(20)

Other Computer Titles of Interest

SCHOOL COMPUTER TEXT BOOKS

Computer Horizons Book 1	S. Addy
Computer Horizons Book 2	S. Addy
Computer Horizons Book 3	S. Addy
Computer Horizons Book 4	S. Addy
Computer Horizons Book 5	S. Addy
Computer Horizons Book 6	S. Addy
Computer Horizons Book 7	S. Addy
Computer Horizons Book 8	S. Addy
Computer Horizons Book 9	S. Addy
Computer Horizons Book 10	S. Addy

ACES Infotech Private Limited.
ACES HOUSE, II-C, Dover Lane, Kolkata-700 029.
☎ : (033) 2461 8110 / 2461 8379/2455 9359, Fax : 91-33-2461-3727
Website : www.acesinfotech.org Email : aces@cal.vsnl.net.in

*Printed by : **PRINTWORLD** Ph. : 98302 75234 / 98832 09594*